মরু ঝরনা

হোসনে আরা শাহেদ

মরু ঝরনা

হোসনে আরা শাহেদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মরু ঝরনা

হোসনে আরা শাহেদ

ইফাবা প্রকাশনা : ৭১৫/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭·৬৪

ISBN : 984-06-0518-6

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৪

তৃতীয় প্রকাশ : জুন ১৯৯৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, সফর ১৪২০

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ ঃ জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ ২১·০০ টাকা মাত্র

MARU JHARNA (Life-sketch of Hazrat Khadiza Ra.) : written by Husne Ara Shahed in Bengali and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. June1999

Price : Tk 21·00 ; US $: 1·00

উৎসর্গ

আমার দাদী

মরহুমা কিবরিয়া খাতুনের

স্মৃতির উদ্দেশে

প্রকাশকের কথা

ইসলামের ইতিহাসে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা) অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহীয়সী মহিলা। শুধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহধর্মিণী রূপেই নন বরং সর্বপ্রথম মুসলমান হিসেবে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বপ্রথম উম্মত হিসেবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সহযোগী হিসেবেও তিনি মুসলিম উম্মাহ্র অন্তরে চির জাগরূক রয়েছেন।

হযরত খাদিজা (রা) কত বড় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনিই সর্বপ্রথম চিনতে পেরেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) সত্যই আল্লাহ্র নবী। ঘোর দুর্দিনে হযরত খাদিজা (রা) তাঁর অতুল ধন-দৌলত অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ইসলাম প্রচারের কাজে। তাঁর সে দানের কথা দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিম নর-নারী কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ রাখবে।

এই মহীয়সী মহিলার পুণ্যময় জীবনী শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'মরু-ঝরনা' বইটি প্রকাশ করে। বর্তমানে হোসনে আরা শাহেদের এ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি আগের মতই বইটি পাঠক সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

সূচিপত্র

কুঁচবরণ কন্যা

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগের কথা।

ঈসায়ী পাঁচশ পঞ্চান্ন সালের কোনও এক মাস।

আরবের কোরাইশ বংশের একটি বনেদি পরিবার।

তাঁদের কতো কতো টাকা-পয়সা! কতো যে তাঁদের নাম-ডাক! কতো খানাপিনা! সে বাড়িতে দিনরাত আনাগোনা অসংখ্য মানুষের। একটি মেয়ে জন্ম নিয়েছে। ভারি সুন্দর দেখতে। যেন একটি লাল গোলাপ। হ্যাঁ, ঠিক গোলাপের মতোই তার গায়ের রং, গোলাপের পাপড়ির মতোই কোমল ও মসৃণ তার গা। মেয়ের মুখ দেখে বাপের মনে খুশির বাঁধ মানে না। মায়ের মুখের হাসি থামে না।

কেন বাঁধ মানবে?

কেন হাসি থামবে?

এ মেয়ে কি সাধারণ মেয়ে?

এরজন্য অনেক অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে না? উদ্বিগ্ন বাবা-মা কতো দোয়াই না করেছিলেন, জানিয়েছিলেন কতো মানত। এমনকি কাবা ঘরে গিয়ে আকুল প্রার্থনা পর্যন্ত করেছিলেন তাঁরা। মুনাজাত করতে গিয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিলেন দু'জনে। অবশেষে করুণাময়ের কাছে তাঁদের আরযি কবূল হলো। তাঁদের ঘরে চাঁদের আলোর বরণ এক মেয়ে এলো।

এ সেই মেয়ে।

এ সেই সন্তান।

সাত রাজার ধনকেও হার মানায়। দুনিয়ার কোনও কিছুর সংগে এ মেয়ের তুলনা হয় না। আনন্দিত বাবা-মা মেয়েকে আদরে আদরে ভরে দিলেন, সর্বশক্তিমানের কাছে বার বার কৃতজ্ঞতা জানালেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁরা মেয়ের নাম রাখলেন খাদিজা। খাদিজার মায়ের নাম ফাতিমা, বাবার নাম খুওয়াইলিদ। খুওয়াইলিদের বংশের ইতিহাস আছে—বড় গৌরবের সে ইতিহাস।

সাগরসেচা মাণিক

সে সময় আরবের সমাজে ছিল বহু দল। দলগুলোর পরিচয় একেকটি গোত্র হিসেবে। একেক গোত্রের একেক নাম। এমনি একটি গোত্রের নাম কোরাইশ। এটি সবার সেরা গোত্র! কাজেকর্মে, চলনে-বলনে, কথাবার্তায় এই পরিবারটি আর আর সচ্ছল গোত্রের চাইতে একেবারে আলাদা। লেখাপড়া ও বনেদিয়ানার জন্যও তাঁদের খুব নাম। খাদিজার আব্বা খুওয়াইলিদের জন্ম এই কোরাইশ পরিবারেই।

ছোট্টকাল থেকেই খুওয়াইলিদ সকলের আদরের পাত্র। সততার জন্য সবাই তাঁকে ভালোবাসে। লেখাপড়ায় তাঁর খুব আগ্রহ। পরিবারের চেষ্টায় আর নিজের গুণে অনেক কিছুই শিখলেন তিনি। তাঁর মতো শিক্ষিত সারা মক্কায় খুঁজে পাওয়া ভার।

খুওয়াইলিদের আব্বা আসাদ ছিলেন একজন মস্তবড় ব্যবসায়ী। তেজারতি করে বিস্তর টাকা-পয়সার মালিক হন তিনি। ছেলেকে নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন। তাঁর অবর্তমানে ছেলে যেন কখনো না ঠকে কারো কাছে. তাই তাকে কাছে কাছে রেখে সব কাজকর্ম শেখালেন, ব্যবসার

সব খুঁটিনাটি বোঝালেন। ছেলে খুওয়াইলিদকে মনের মতো করে মানুষ করলেন।

খুওয়াইলিদ লেখাপড়া আর ব্যবসা দু'টোতেই চমৎকার জ্ঞান লাভ করলেন। আব্বা মারা যাওয়ার পর কাজ-কারবার সব নিজের হাতে তুলে নিলেন খুওয়াইলিদ। যত্নে আর চেষ্টায় বাপের কারবার আরো জমজমাট করে তুললেন। মক্কার বাইরেও কতো কতো দেশে যে তাঁর ধন-সম্পদ হলো, তার লেখাজোখা নেই।

তা বলে খুওয়াইলিদ কিন্তু মোটেও টাকা-পয়সা বেহুদা আগলে রাখেন না। টাকাকড়ি বখিলের মতো জমিয়ে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না। কেউ যখন এসে হাত পাতে, না করেন না। দরকারে কেউ ছুটে এলে ফিরিয়ে দেন না। সকলের বিপদে তিনি অকাতরে সাহায্য করেন।

গরীব-দুঃখীদের জন্য তাঁর বড় মায়া। আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাঁর খুব টান। পাড়া-পড়শিদের দিকে তাঁর খুব খেয়াল। আপন-পর বাছবিচার নেই। সকলের জন্যই খুওয়াইলিদ সমানভাবে ভাবেন। তাঁর মন সকলের জন্যই সমানভাবে কাঁদে।

লোকেরাও তাঁকে বড় ভালোবাসে, সম্মান করে। কেবল আশেপাশের বা নিজ এলাকার নয়, দূর-দূরান্তের মানুষও তাঁর নাম জানে। তাঁর কাছে ছুটে আসে। দরকারে অদরকারে তাঁর সংগে দেখা করে। বিপদে-আপদে পরামর্শ করে। খুওয়াইলিদ বিরক্ত হন না। কাউকে কটুকথা কন না, সবাইকে সম্মান করেন। সবার সাথে কথাবার্তা বলেন। সবাইকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাই সবাই বলে—না, এমন মানুষ আর হয় না। তিন মুলুকে আমাদের খুওয়াইলিদ আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না।

এমন মানুষের মনেও শান্তি নেই; কারণ, তাঁর কোনও ছেলেপুলে নেই। একটি শিশুর অভাবে তাঁর ঘরে হাসি নেই। আনন্দ নেই।

খুওয়াইলিদ যখন এমনি মনমরা, একটি সন্তানের জন্য যখন এমন অধীর, তখন তাঁর জন্য চিন্তা করে দেশের মানুষও। তাঁরাও তাঁর জন্য মুনাজাত করেন—'হে দয়াময় আল্লাহ্! আমাদের খুওয়াইলিদের মনে দুঃখ রেখো না, তাঁকে একটি সন্তান দাও।' আল্লাহ্ সে আরমান কবূল করলেন।

সেই সন্তান এই খাদিজা।

কেবল বাবা-মা নন, কেবল বাড়ির লোকজনই নন, কেবল আত্মীয়-স্বজনই নন- যে যেখানে ছিলেন সবাই খুব খুশি হলেন, আর প্রাণভরে শুকরিয়া জানালেন—'আহা, বেঁচে থাকুক! বেঁচে থেকে মেয়ে বাপ-মা'র আশা পুরা করুক, প্রাণ জুড়াক।'

সোনায় সোহাগা

তা হলে কী বলা চলে খাদিজাকে? আলালের ঘরের দুলালী? হ্যাঁ, একশোবার।

খাদিজার জন্য কাতর বাবা-মার প্রাণ। এক দণ্ড না দেখলে বাবা চোখে আঁধার দেখেন, একটু কেঁদে উঠলে মা আকুল হন।

খাদিজার হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে।

খাদিজার চাহনিতে যেন ফুল ফোটে।

রূপ, আ-কী সুন্দর রূপ! গায়ের বরণটি ঠিক যেন দুধে-আলতা। শরীর থেকে ফুটে বেরোয় যেন একটি উজ্জ্বল আভা। সারা গায়ে যেন গোলাপের আবির মাখা।

শুধু রূপে নয়—সব বিষয়েই এ মেয়ে যেন আলাদা। একরত্তি মেয়ে ঠিক সময় ছাড়া দুধ খেতে চায় না। যখন তখন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কান্না জুড়ে দেয় না।

একটু বড় হলে দেখা গেল, খাদিজা সত্যি আশ্চর্য গুণে ভরা। আর সব শিশুর মতো খেলার পাগল নয়। বড় শান্ত মেয়ে, অযথা কাউকে জ্বালায় না। খালি খালি কারো সংগে মেজাজ করে না। কথায় কথায় আবদার ধরে না। সকলের মুখে ছোট্ট খাদিজার তারিফ।

একটু একটু করে বড় হতে থাকলো খাদিজা। তার আদব-লেহাজ, কথাবার্তা, আলাপ ব্যবহারে সকলেই খুশি। কী তাজ্জব! কখনও কিনা এতটুকু মিথ্যা কথা বলে না! তার মুখে কোনও দিন একটি কটু কথা শোনা যায় না! সংগীসাথী ও ছোটদের ভালোবাসে আপন ভাইবোনের মতো। কারও সাথে ঝগড়া না, কারও নামে নালিশ না, এমন মধুর স্বভাবের জন্য সবাই ওকে ভালোবাসে, ওর ভালো কামনা করে।

ঠিক এ জন্যই সবাই মুখে মুখে খাদিজাকে 'তাহিরা' বলতে শুরু করে।

তাহিরা শব্দের মানে হলো 'পবিত্র'। সত্যিই ভালোমেয়ে খাদিজা। এত আদর, এত সুনাম, এত খ্যাতি, অথচ ওর মনে এতটুকু দেমাগ নেই। বরং ও-যেন আরও শরম পায়, বিনয়ে আর নম্রতায় যেন মাটির সাথে মিশে যেতে চায়।

আরও বড় হলেন খাদিজা। বুদ্ধিরও আরো খোল্‌তাই হলো। বড়লোক বাপের আদরের মেয়ে হলে হবে কি, খাদিজা কিন্তু মোটেও স্বার্থপর না। বড় সহজ ও সরল মনের ও। আর চলেনও খুব সাদাসিধে ভাবে। ওর

প্রাণটা নরম আর কোমল। পরের দুঃখ দেখলে মন কেঁদে ওঠে। অন্যের দুঃখে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরের জন্য এতো যে মায়া ও ভাবনা, এটিই পরে খাদিজার জীবনের বড় গুণ হয়ে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

মেয়ের মধ্যে এত দুর্লভ গুণ দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো বাবা–মার মন। তাঁরা মেয়ের কোনও ইচ্ছায় বাদ সাধেন না। তাকে তার পছন্দ মত দান–খয়রাত করতে দেন। যাতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়, হামেশা সে ব্যবস্থাই করেন।

মেয়ে বলে হেলা নেই

দেখতে দেখতে খাদিজা কৈশোর অতিক্রম করে। ধনে–মানে–জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বাপের নীলমণি খাদিজা তার সব কিছুর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁর অবর্তমানে তার ওপর অনেক দায়িত্ব পড়বে।

খুওয়াইলিদ তা চিন্তা করেন।

তাঁর মেয়ের কোন ভাই নেই। একজন বোনও নেই। একেবারেই একা। এতবড় বিষয় কারবার একদিন তো ওকেই দেখতে হবে!

খুওয়াইলিদ ভাবেন আর ভাবেন।

একদিন মেয়েকে কাছে ডাকলেন। পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—

ঃ শোন মা, তোমার তো আর কেউ নেই, তুমি বড়ই একা।

ঃ কেন আব্বা? একথা বলছেন কেন? আপনি আছেন, আম্মা আছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি আর কিছু চাই না।

খুওয়াইলিদের চোখে পানি আসে।

কী করে মেয়েকে তিনি বোঝাবেন?

তিনি তো অমর নন! খাদিজার মা ফাতিমাও কি চিরকাল বেঁচে থাকবেন? সবাইকে তো মরতে হবে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম।

তিনি বললেন—'না, তা নয়। আজকের কথা হচ্ছে না। অনেক পরের কথা বলছি। তুমি বড় হবে। একদিন তোমাকেই তো আমার তেজারতি ব্যবসা সব বুঝে নিতে হবে।'

খাদিজা চুপ করে থাকেন।

খুওয়াইলিদ শান্ত স্বরে বললেন—'তোমাকেই তো আমার কাজ করতে হবে। আমি কত কষ্ট করে এ ব্যবসা-বাণিজ্য বড় করেছি। আমার আব্বার সাধ পূরণ করার চেষ্টা করেছি। আমার আশা, তুমি আমার কাজ আরও এগিয়ে নেবে। তোমার বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে আরও সুন্দর করে তা গড়ে তুলবে। তুলবে না?'

ঃ আমি কি পারবো আব্বা?

খুওয়াইলিদ বললেন—'কেন পারবে না? তুমি তো কেবল আমার মেয়ে নও, ছেলেও। তুমি আমার কতো বড় ভরসা। তোমাকে পেয়ে তোমার আম্মা আর আমি কতো খুশি হয়েছিলাম। তুমি আমাদের স্বপ্ন মা!'

খাদিজা বললেন—'জানি আব্বা। আপনি আমাকে বলে দিন কী করতে হবে। আমি তাই করবো। আমি কখনো আপনার অবাধ্য হইনি—হবোও না।'

ঃ এই তো সুন্দর কথা মা। আমি আর কিছু চাই না। আমি চাই তুমি সব বুঝে নাও। যদি তোমার জ্ঞান থাকে, তুমি পারবে সব চালাতে। নইলে

লোকজন তোমার না-জানার সুযোগ নেবে, তোমাকে ঠকাবে। আমি চাই, তুমি যেন জীবনে আঘাত না পাও, তোমার আম্মাও তাই চান।

ঃ কিন্তু আব্বা, আমি যে মেয়ে।

ঃ না মা, তাতে কি হয়েছে? ছেলে হোক, মেয়ে হোক, সেই মানুষই শ্রেষ্ঠ—যে বুদ্ধি আর জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ।

তুমি ভালোভাবে পড়াশোনা করো, জ্ঞান অর্জন করো। আর আমার ব্যবসা সব বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি কামিয়াব হবে।

ঃ ঠিক আছে, আমি সব করতে চেষ্টা করবো আব্বা, আপনি দোয়া করুন আমাকে।

বাস্তবের মুখোমুখি

আব্বার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললেন খাদিজা। মন দিয়ে পড়াশুনা করে অনেক জ্ঞান লাভ করলেন। এত কষ্ট করে, এমন চেষ্টা করে পড়াশুনা করে খাদিজা তার ফলও পেলেন। খাদিজা পরম বিদুষী হলেন। লোকে খাদিজার জ্ঞানের তারিফ করে।

সেই সাথে খাদিজা তাঁর আব্বার কাজও শিখলেন। তাঁর সাথে থেকে তাঁর কারবার সব বুঝলেন। দেখলেন, কেমন করে তিনি বুদ্ধি খরচ করে কাজ করেন, কখন কি করবেন, তার জন্য অনেক আগে থেকেই ভাবনা-চিন্তা করেন। হঠাৎ কিছু ঘটলেও ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত নেন,—কেমন করে আব্বা মানুষের সংগে কথাবার্তা বলেন, কেমন করেই বা এত লোকজন খাটান। বাবাকে কেন ছোটবড় সকলে ভালবাসে, কেনই বা সবাই এমন মানে, তাও খাদিজা অনুভব করতে চেষ্টা করলেন।

বুদ্ধিমতী খাদিজা আব্বা যা শেখালেন, তা তো শিখলেনই, এমনি করে নিজেও দেখেশুনে অনেক শিখলেন। তাঁর এ জ্ঞান তাঁকে ব্যবসা-বাণিজ্যেও জ্ঞানী করে তুললো।

পিতার ইন্তিকাল

খুওয়াইলিদ একটু একটু করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েন।

ছোটখাটো অসুখ আস্তে আস্তে তাঁকে কাহিল করে তোলে। এমনি অবস্থায় কতদিন আর শক্ত থাকবেন—একদিন বিছানা নিলেন। খাদিজা ব্যাকুল হলেন। শহরের বড় হেকিম আনালেন, চিকিৎসা করালেন। ওষুধ এলো, পথ্যি দেয়া হলো। খাদিজা দিনরাত আব্বার মাথার কাছে বসে থাকেন। প্রাণপণ সেবা করেন। কিছুতেই কিছু হয় না দেখে খাদিজা বেচাইন হয়ে উঠেন। তাঁর চোখে অশ্রুর ঢল নামে।

খুওয়াইলিদ অসুস্থ হলেও সব বুঝতে পারেন। একদিন একটু ভালো বোধ করলে মেয়েকে বোঝান—'অমন উতলা হতে নেই মা, মানুষ চিরদিন বাঁচে না।'

ঃ না, না, অমন করে বলবেন না। আপনি সেরে উঠবেন।

ঃ ভালো করার মালিক আল্লাহ্। তবু সব মানুষকেই যেতে হয়। আমিও যাবো। তুমি শান্ত হও। তোমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে মা।

খাদিজা কান্নায় ভেংগে পড়েন।

আব্বা বলতে থাকেন—'তোমাকে আমি সব রকম তালিম দিতে চেষ্টা করেছি। ভালো করে সব দেখো মা, লোকে তোমাকে 'তাহিরা' বলে ডাকে, তুমি আজীবন তার মূল্য দেয়ার চেষ্টা করবে।'

এর কিছুদিন পরে খুওয়াইলিদ মারা গেলেন।

খুওয়াইলিদের রাশি রাশি ধন–দৌলতের মালিক হলেন খাদিজা। তাঁর ওপর বিরাট দায়িত্ব পড়লো। বাপের ব্যবসা পরিচালনার ভার মেয়ের একার। আব্বাকে হারানোর শোক খাদিজা সামলে নিলেন। নিজে সব কাজ দেখাশোনা করেন। দিনরাত খাটেন। দরকার হলেই সকলের সংগে আলোচনা করেন। সকলের মতামত শোনেন, তারপর কি করবেন নিজে ঠিক করেন।

আব্বার উপদেশ সব সময় মনে রাখেন। ছোট–বড় সকলের সংগে ভাল ব্যবহার করেন। দাসদাসীকে নিজের ভাইবোনের মত স্নেহ করেন। হিসাবের পাওনা ছাড়াও ভালো কাজের জন্য তাদের ইনাম দেন। তাদের দরকারে সময়ে অসময়ে সাহায্য করেন। তারাও খাদিজাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। খাদিজার কাজকে নিজের কাজ মনে করে। সবাই খাদিজার বড় বাধ্য আর অনুগত। সকলের সহযোগিতায় দেখতে দেখতে কিছুকালের মধ্যেই খাদিজা পৈতৃক কারবারে যশ–খ্যাতি বাড়িয়ে তুললেন। তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই বলাবলি করে—'বাব্বা, ধন্যি মেয়েই বটে!'

ঈমানদার লোকের খোঁজে

সুনাম যতোই বাড়ে ব্যবসা–বাণিজ্যেরও ততো প্রসার ঘটে। খাদিজা একা আর কুলিয়ে উঠতে পারেন না। পরিচালনা ও দেখাশোনায় তাঁর একজন সাহায্যকারী দরকার। বিশেষ করে দূর দূর এলাকায় যাওয়া সে তো তাঁর পক্ষে সম্ভব না। তাই একজন ভালো লোক চাই।

কিন্তু যে সে মানুষ হলে তো চলবে না।

এমন একজন চাই, যাঁকে বিশ্বাস করা চলে,
যাঁর ওপর নির্ভর করা চলে,
যিনি কখনো বিশ্বাস ভাংবেন না,
যিনি কখনো ফাঁকি দেবেন না।
কিন্তু কোথায় তেমন মানুষ?
এমন লোক তো পাওয়া কঠিন।
খাদিজা ক'জনকে আর চেনেন?
ক'জনকেই বা আর তিনি জানেন?
তিনি নতুন করে ভাবনায় পড়েন।
একজন ভালো আর অভিজ্ঞ মানুষ তালাশ করতে থাকেন।

আল-আমিন

চাচা আবূ তালিবের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্যের তালিম নিচ্ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। এই চাচার সংসারেই বড় হয়েছেন তিনি। ছোট্টকাল থেকেই চাচা তাঁর সব, চাচার কাছেই তাঁর যত আবদার আহলাদ। আব্বাকে তিনি চোখে দেখেননি কোন দিন। তাঁর জন্মের আগেই তিনি মারা যান। মাকেও ভালো করে মনে পড়ে না। মাত্র ছয় বছরের যখন, তখন মা আমিনা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। দাদা আবদুল মুত্তালিব কোলেপিঠে করে মানুষ করতে থাকেন তাঁকে, কিন্তু সেও দু'টি বছর মাত্র। এরপর তিনিও তাঁকে ফেলে চিরকালের জন্য বিদায় নেন। তারপর চাচা আবূ তালিব তাঁকে বুকে টেনে নেন। তিনি একাই তাঁর সব অভাব পূরণের চেষ্টা করেন।

আবূ তালিবের টানাটানির সংসার। তাঁর পরিবারে বেশ ক'জন লোক। কিন্তু টাকা উপার্জনের মানুষ তিনি কেবল নিজে। একার আয়ে এতবড় সংসার চালানো কি চাট্টিখানি কথা? তবু ভাতিজাকে তিনি কাছ ছাড়া করেন না।

তাঁর জন্য তাঁর দারুণ মায়া।

আবূ তালিব মানুষটি বড় ভালো।

নিজের ছেলেমেয়ের সাথে সাথে ভাবতেন মুহাম্মদের কথাও। বালক মুহাম্মদকে কি করে রোজগারি করে তুলবেন, কিভাবে তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবেন, এ নিয়ে তিনি সারাক্ষণ ভাবেন।

তাঁর নিজের শখ ছিল ব্যবসা–বাণিজ্যে; কিন্তু ব্যবসা তো এমনি এমনি হয় না? এজন্য প্রথমেই চাই কিছু টাকা। এরই তো নাম মূলধন—পুঁজি।

তিনি এই মূলধনের অভাবে তেমন কিছু করে উঠতে পারছেন না। মাঝে মাঝে হাতে কিছু এলে টুকটাক ব্যবসা করেন। কিছু জিনিসপত্র কিনে দেশের বাইরে চলে যান। সেখানে কিছু লাভে বিক্রি করে দু'পয়সা ঘরে আনেন। আবার লাভের অংশ থেকে নতুন করে পণ্য কেনেন আর চাহিদা বুঝে দেশে–বিদেশে যাওয়া–আসা করেন। এমন কাজে তিনি সব সময় মুহাম্মদকে সংগে সংগে রাখেন।

চাচার সংগে ঘুরে ঘুরে মুহাম্মদ ব্যবসা–বণিজ্যে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। বাণিজ্যের সুবাদে মুহাম্মদ যেখানে যেখানে গেলেন, সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো।

ছেলেবেলা থেকেই মুহাম্মদ সকলের প্রিয়পাত্র।

তাঁর নম্র চালচলন ও ভদ্র আচরণের জন্য দেশের সবাই তাঁকে ভালবাসেন।

তিনি কখনও সত্য লুকান না।

তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।

তিনি মিথ্যাকে ঘৃণা করেন।

যে মিথ্যা বলে তাকে পছন্দ করেন না।

মিথ্যাবাদীর সাথে তিনি বন্ধুত্ব করেন না।

তাঁর এমন সুন্দর স্বভাবের জন্য লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম হয় 'আল-আমিন'।

তাঁর দায়িত্বজ্ঞান খুব বেশি।

যে কোন কাজ তিনি হাতে নেন, পুরা করে ছাড়েন। কাজ সারা না হওয়া অবধি তাঁর মনে শান্তি থাকে না।

কাউকে কোন কথা দিলে সে ওয়াদা তিনি কক্ষনো ভংগ করেন না।

তাঁর প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নতুন জীবন

দিন যায়

মাস যায়—

বছর পার হয়—

খাদিজা তাঁর ব্যবসা চালাবার জন্য মনের মত লোক খুঁজে পান না।

এক সময় তাঁর কানে এলো আল-আমিন মুহাম্মদের কথা।

তাঁর গুণের কথা শুনে তিনি খুশি হলেন।

ভাবলেন, এমন মানুষই তো তিনি এতদিন ধরে খোঁজ করছেন! একটু আলাপ করে দেখাই যাক না, ক্ষতি কি!

মুহাম্মদের কাছে তিনি লোক পাঠালেন। কেবল লোক নয়, সেই সংগে ব্যবসায়ে কাজ করার প্রস্তাবও। বললেন, মুহাম্মদ যদি রাযী থাকেন, তবে লাভের হার আর সবার চাইতে তাঁকে বেশিই দেবেন।

মুহাম্মদ সব শুনলেন কিন্তু কথা দিলেন না।

বললেন—'আমি আগে আমার চাচার সাথে আলাপ করে নিই। পরে জানাবো।'

চাচা বাড়ি এলে মুহাম্মদ তাঁকে সব খুলে বললেন।

শুনে তো আবূ তালিব মহাখুশি। খাদিজার নাম শহরে কে না জানে? তাঁর সংগে কাজ করতে পারা তো পরম ভাগ্যের কথা!

এ নিয়ে তো ভাবাভাবির কিছু থাকতে পারে না!

আবূ তালিব তক্ষুণি লোক পাঠান খাদিজার কাছে।

তাদের সংগে খাদিজা একদিন আলোচনায় বসলেন।

মুহাম্মদকে তিনি তাঁর ব্যবসার কাজে নিয়োগ করলেন।

কিছুদিন পরে হযরত মুহাম্মদের সংগে খাদিজার বিয়ে হলো। এ বিয়েতে সবাই খুব খুশি হলেন। বিয়ের পরই হযরত খাদিজা তাঁর ধন-দৌলত বিষয়-সম্পত্তি সবই হযরতের নামে লিখে দিলেন।

কিন্তু দিলে হবে কি, হযরত মুহাম্মদের এ সবের দিকে খেয়াল নেই।

তিনি বললেন—'এ সব দিয়ে আমি কি করবো? আমার এসব কিছুই লাগবে না।'

খাদিজা বললেন—'না এখন থেকে কিছুই আমার না। এ সবই আপনার।'

হযরত এই বিপুল অর্থরাশি দীন-দুঃখী অনাথ-এতিমদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। কাউকে দিলেন খাবার কেনার জন্য, কাউকে দিলেন চিকিৎসা করার জন্য, কাউকে দিলেন ঘরবাড়ি তৈরির জন্য। কেউ অভাবে পড়ে তাঁর কাছে হাত পাতলে—তাকেই তিনি সাহায্য করলেন।

কাউকে ফিরিয়ে দিলেন না।

কাউকে হতাশ করলেন না।

তাঁর এ দানে সবাই সুখি হলো, খুশি হলো।

সবাই প্রাণভরে তাঁকে দোয়া করলো।

হযরত খাদিজারও আনন্দের শেষ নেই। তাঁর টাকা-পয়সা এমন ভালো কাজে খরচ হচ্ছে দেখে তিনি নিজেই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালেন।

আর এক আলয়

কিন্তু এত কিছুতেও হযরতের মনে শান্তি নেই।

তিনি দেশ, মানুষ ও সমাজের কথা ভাবেন। দেশের সামাজিক অবস্থা একটুও ভালো না। মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। কথায় কথায় খুন-খারাবি অবধি ঘটে। কারও সাংঘাতিক ক্ষতি করলেও কেউ কিছু বলে না। দেশে বিচার-আচার বলতে কিচ্ছু নেই।

গরীবের ওপর বড়লোক খুব জুলুম করে।

হাটবাজারে মানুষ বেচাকেনা হয়।

যাকে কিনে আনা হয়, তাকে গোলাম বলা হয়।

একজন গোলাম জীবনভর আর আযাদ হতে পারে না। তাকে তার মনিব যা বলে, তাই করতে হয়। সারাদিন কাজ আর কাজ। পেট পুরে খানা নেই, চোখ ভরে ঘুম নেই, তার নিজের বলতে কিছুই নেই।

মেয়েদেরও প্রায় একই দশা। তাদের চলাফেরায়, কাজেকর্মে কোন স্বাধীনতা নেই।

যেন তারা কলের পুতুল। কোন বাপ চায় না তাঁর মেয়ে হোক। মেয়ে হলে সুযোগ পেলেই মেরে ফেলে।

এমন অবস্থা মুহাম্মদের ভালো লাগে না।

তিনি কেবল চিন্তা করেন। তাঁর মনে হয় পশুর মত এ জীবনের কী দাম? মানুষ মানুষকে দুশমন মনে করে, মানুষের জন্য মানুষের মমতা নেই—এ কেমন বেঁচে থাকা? এমন লোভ, এমন হিংসা—এটা তো মানুষের কাজ হতে পারে না।

চিন্তায় চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-কড়ি, আরাম-আয়েস কোন কিছুই তাঁর মনে শান্তি দিতে পারে না।

আসলে তিনি তো দুনিয়ার সুখভোগ করতে আসেননি—তিনি এসেছেন দুনিয়ার মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে। তিনি এসেছেন দুঃখীর দুঃখ দূর করতে, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করতে। তিনি এসেছেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচাতে।

এ জন্যেই তাঁর কাছে রাশি রাশি সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত কিছুই ভালো লাগে না।

নবুয়ত লাভ

হযরতের কাজ মানুষের ভাল করা।

তিনি দুঃখীর সেবা করেন, অসহায়কে আশ্রয় দেন।

অবসর পেলেই হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় চলে যান।

সেখানে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন।

খাওয়ার কথা মনে থাকে না, বাড়ির কথা মনে থাকে না, আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে থাকে না। কোন কোন দিন তিনি অনেক রাতে ঘরে ফেরেন, কখনও বা ফেরেনই না।

হযরত খাদিজা (রা) স্বামীর এ ভাবনা লক্ষ্য করেন।

তিনি তাঁর কাজে কখনো বাধা দেন না। কখনো তাঁর অসুবিধা করেন না। বরং কী করলে মুহাম্মদ সুখী হবেন, কী করলে তাঁর ভালো লাগবে, তিনি তাই করতে চেষ্টা করেন।

হযরত হেরা পর্বতে যাওয়ার সময় নিজ হাতে তাঁর খাবার তৈরি করে সংগে দিয়ে দেন। যেদিন তিনি ফেরেন না, সেদিন তিনি নিজেই গিয়ে সেখানে তাঁর খাবার পৌঁছে দিয়ে আসেন। হযরতের শরীরের দিকে তিনি সযত্ন নজর রাখেন।

খাদিজা হযরতকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। তিনি মনে মনে ঠিকই বোঝেন, হযরত সাধারণ কেউ নন। তাই ভুলেও তাঁর ইচ্ছায় বাদ সাধেন না। তাঁকে কোন প্রশ্ন করেন না।

হযরত যা বলেন, তাই করেন। হযরত যা বলেন, তাই মানেন।

দীর্ঘ পনের বছর পর হযরত নবুয়ত লাভ করলেন।

তখন তাঁর বয়স চল্লিশ।

এই পনের বছর হযরতের জন্য খুব কঠিন সময় ছিল।

এই দিনগুলোতে হযরত খাদিজা তাঁকে খুবই সাহায্য করেন।

তাঁর মনে সাহস সঞ্চার করেন। খাদিজা বিদুষী মহিলা—তৌরাৎ ও ইনজিল কিতাব তাঁর পড়া। তাঁর যেমন ধৈর্য, তেমনি সাহস। তিনি হযরতকে প্রেরণা জোগান। তিনি সব সময় বলেন—'আপনি দুনিয়ার মানুষের জন্য এত ভাবেন। আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে পরম প্রিয়। তাঁর অনুগ্রহ আপনার ওপর পড়বেই। আপনার যা ভালো লাগে, তাই করুন।'

হযরত খাদিজার আশ্বাসে হযরত মুহাম্মদ (সা) মনে অনেক উৎসাহ পান। তিনি কঠিন সাধনায় মগ্ন থাকেন।

একদিন তিনি আল্লাহ্‌র বাণী লাভ করেন ঃ 'পাঠ করো তোমার রবের নামে—যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি কলম দিয়ে মানুষকে শিখিয়েছেন—যা সে জানতো না। তাঁর কোনও অংশীদার নেই, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।' এ সত্য মানুষকে জানাতে হবে। এ সত্য মানুষকে বোঝাতে হবে। এ দায়িত্ব এসে পড়লো মুহাম্মদের ওপর।

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র পাঠানো রসূল।

এ বাণী বয়ে আনলেন একজন ফেরেশতা।

তাঁর নাম জিবরাঈল (আ)।

এটাই হযরতের নবুয়ত লাভ।

ক্ষমতাবানদের মান

হযরতের নবুয়ত লাভে হযরত খাদিজা (রা) আনন্দিত হন।

তিনি সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারে মন দিলেন—

'আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।'

তিনি আরও বললেন—'মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। ছোট-বড়, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সবাই সমান।

'কাজেই মানুষে মানুষে হানাহানি অন্যায়। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ভালো নয়। অসহায়কে লাঞ্ছনা দেয়া অপরাধ। মানুষকে গোলাম মনে করা নিন্দনীয়।

'মিলেমিশে থাকা মানুষের ধর্ম। অপরের বিপদে সাহায্য করা মানুষের কাজ। দুস্থ ও আর্তের সেবা করা মানুষের কর্তব্য। মেয়েদের অপমান করা উচিত নয়। বাপের ঘরে তাদেরও সমান অধিকার। বাপ-মাকে তাজিম করা সন্তানের জন্য ফরয।'

কিন্তু মক্কার লোকেরা তাঁর কথা শুনতে চায় না।

এতদিনের অভ্যাস তারা হযরত (সা)-এর কথায় ছাড়তে রাযী হয় না।

তারা অসহিষ্ণু হয়।

তারা ক্ষেপে যায়।

তারা মুহাম্মদ (সা)-কে এসব বলতে মানা করে দেয়।

মুহাম্মদ (সা) তাদের নিষেধ মানেন না।

তিনি তাদের বোঝান।

বার বার বলেন—'তোমরা যা করছো, তা ঠিক নয়। ভালো কাজ করো। ভালো হয়ে যাও। অন্যকেও ভালো হতে দাও।'

কোরাইশরা হুংকার দেয়—

ঃ না, তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

তুমি এসব কথা বলতে পারবে না।

যদি আমাদের নিষেধ না শোনো—

যদি আমাদের কথা না মানো—তবে জেনে রাখ, আমরাও চুপ করে থাকব না। আমরা এসব সহ্য করবো না।'

কিন্তু মুহাম্মদ (সা) তাদের হুমকিকে পরোয়া করেন না।

তিনি একটুও ভয় পান না।

তিনি হাসিমুখে বলেন—'তোমরা আবার ভুল করছো। তোমরা আমার কথা শোনো—সৎ জীবন যাপন করো। সত্য পথে এসো।'

কোরাইশরা দারুণ রেগে যায়। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করে ঃ আর মুখের কথায় নয়, এবার মুহাম্মদকে বাধা দিতে হবে।

নইলে মুহাম্মদ আরও বাড়াবাড়ি করবে।

শুরু হয় জুলুম। যে যেমন পারে, মুহাম্মদ (সা)-কে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করে। পদে পদে তাঁর সংগে শত্রুতা করতে থাকে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শি, সারা দেশবাসী—যে যেখানে আছে মুহাম্মদের সংগে অসহযোগিতা করতে শুরু করে। তাঁকে বিপদে ফেলতে উঠেপড়ে লাগে।

তবু যখন কিছুতেই কিছু হয় না—

তবু যখন মুহাম্মদ (সা) কাবু হন না—

তবু যখন তিনি তাঁর কথা বন্ধ করেন না—

তখন আবার কোরাইশরা সভায় বসল।

আবার তারা দলের মাথারা মজলিস বসাল।

সে জমায়েতে প্রত্যেকেই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বলল।

একজন ফোঁস করে বলে উঠলো—'এমন অবস্থায় আর তো চুপ করে বসে থাকা যায় না! মুহাম্মদ কাউকে ভয় পাচ্ছে না। শত অত্যাচারেও পিছপা হচ্ছে না।'

অন্যজনও তার কথায় আগুন ছড়ালো—'এমনটি হলে, এমন ধারা হতে থাকলে আর দু'দিন পরে আমরা তো পাত্তাই পাবো না!'

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদেরও তাই ভাবনা। যারা ছোটলোক, যারা গরীব লোক, তারা সব আস্কারা পেয়ে যাবে।

ঃ যাবে বলছ কি? বল যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, অনেক জায়গায় দু-চারজন করে মুহাম্মদের কথা শুনছে। তাঁর দলে গিয়ে ভিড়ছে।

সত্যের সপক্ষে

আসলে ঠিক তাই।

দু-চারজন করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শুনছেন।

তাঁর কথামত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন।

এবার তারাও কোরাইশদের শত্রু হলো।

মুহাম্মদের কথামত কাজ করার অপরাধে তাদের ওপরও জুলুম আরম্ভ হলো।

হযরত মুহাম্মদ (সা) নীরবে সব সহ্য করেন। কোথায় কী হচ্ছে, তিনি সব খোঁজ রাখেন।

তাঁর কথা মেনে কার কী বিপদ ঘটছে, সব খবরাখবর নেন।

কাউকে কিছু বলেন না।

কারুর বিরুদ্ধে একটি কথাও না।

সব কথা তিনি ঘরে এসে হযরত খাদিজা (রা)-কে বলেন।

প্রতিটি ঘটনা হযরত খাদিজার সাথে আলোচনা করেন।

হযরত খাদিজা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন।

তিনি তাঁকে উৎসাহ দেন।

তিনি বলেন—'ভালো কাজে বাধা তো আসবেই। কোরাইশরা এতদিনের বদ্ অভ্যাস একদিনে ছাড়বে কেন? ওরা ওদের কাজ করবেই; কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি কেউ ইনশাআল্লাহ্ করতে পারবে না।'

হযরত (সা) খুশি হন।

তিনি তো আর ভয় পান না।

তবু খাদিজার প্রেরণা তাঁর ভালো লাগে।

সারাদেশ যখন তাঁর শত্রু, তখন একমাত্র ঘরেই তাঁর শান্তি।

খাদিজা (রা) সত্যিই মহীয়সী!

তিনিই তো তাঁর ওপর অগাধ শ্রদ্ধা রাখেন।

তাঁকে আখেরী নবী বলে শ্রদ্ধা করেন।

তাঁর কথায় প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) মনে মনে খাদিজার তারিফ করেন।

তিনি না থাকলে আজ এ শান্তিটুকু কোথায় পেতেন?

এমন দিনে এমন একজন জীবন সংগিনী পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

শুধু কি জীবন সংগিনী?

তিনি তো সহধর্মিণীও।

মমতায় অপরূপা

মারধরে কাজ হলো না,

অত্যাচারেও লাভ হলো না,

কষ্ট দিয়েও ফায়দা হলো না—

কোরাইশরা এবার কী করলো?

এবার তারা নতুন চাল চালতে আরম্ভ করে।

এবার তারা নও-মুসলিমদের রুযী-রোযগার বন্ধের ব্যবস্থা করে। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর নতুন সংগী-সাথীরা যেন কিছু করে খেতে না পারেন, সে চেষ্টায় মাতে।

তারা এমনভাবে কাজ করতে লাগলো মুসলমানেরা যেন কোথাও কাজ না পায়।

তারা যেন টাকার অভাবে না খেয়ে থেকে কষ্ট পায়—

তারা যেন পেটের জ্বালায় মুহাম্মদের দল ছাড়তে বাধ্য হয়।

এমন অবস্থায় হযরত খাদিজা (রা) এগিয়ে আসেন।

তাঁর যত টাকাকড়ি তিনি তো আগেই হযরতের হাতে তুলে দিয়েছেন। এবার বললেন—'এসব আপনি আপনার সংগীদের জন্য খরচ করুন। কেউ যেন দুঃখ না পায়, টাকার অভাবে কেউ যেন দুর্ভোগ না পোহায়।'

তিনিও ইসলাম প্রচারে হযরতের সাথী হলেন। তাঁর অতুলনীয় দানের জন্য তিনি সেই ছোট্টকাল থেকেই সবার প্রিয়। তাঁর কথায় অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন।

কিন্তু আবার কোরাইশরা ক্ষেপে উঠলো—

ঃ কী, খাদিজাও এসব বলছে! আমরা যা করি, তা খাদিজার চোখেও এমন খারাপ লাগছে?

তারা রুখে উঠলো। বেশ, তবে তাই হোক—খাদিজাও কষ্ট পাক। খাদিজাকেও ছাড়া হবে না। মুহাম্মদের পক্ষে যে-ই বলবে, তাকেই আমাদের লাঞ্ছনার জন্য তৈরি হতে হবে!

অতএব কোরাইশরা খাদিজার বিরুদ্ধে গেল।

ধনী কোরাইশরা এরই মধ্যে খাদিজা (রা)-কে বোঝাতে এলো—'তোমার তো বোন পয়সাকড়ির অভাব নেই। তবে তুমিও কেন চাও আমাদের ক্ষতি হোক?'

হযরত খাদিজা (রা) জবাব দেন—'আমি কারো ক্ষতি চাই না, আমি চাই সবার ভালো, সবার কল্যাণ।'

ঃ কী করে?

ঃ কেন, যা বলছি, তা কি শুনতে পাও না?'

ঃ শোন, ওতে আমাদের মানে যাদের ধন আছে, সম্পদ আছে, তাদের লাভ নেই। আমাদের লোকেরা আর গরীব মানবে না। আমরা আর চাকর-বাকর খাটাতে পারবো না।'

ঃ ঠিক আছে, খাটাতে না পারি খাটাবো না। জেনে রেখ, সব মানুষ সমান। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। সবাই এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি।

ঃ তাহলে তুমিও তোমার স্বামীর কথা বলছ?

ঃ নিশ্চয়ই। আমি তো কবেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। জানো না বুঝি?

এবারে হযরত খাদিজা (রা)-এর বিরুদ্ধেও সবাই লেগে গেল।

খাদিজা (রা) ভীত হন না।

হযরতকে সাহস জোগান, অভয় দেন।

বলেন—'কষ্ট তো হবেই। তাই বলে আমরা পিছিয়ে পড়বো কেন? আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন।'

হযরত (সা) নিশ্চিন্ত হন।

তিনি তাঁর কাজ করতেই থাকেন।

অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

সেবায় অনন্যা

কোরাইশরা মরিয়া হয়ে উঠলো।

রাগে তারা বেপরোয়া হয়ে গেল।

ঠিক করলো, এসব আর তারা সহ্য করবে না।

মুহাম্মদকে এবারে জানে শেষ করে ফেলবে।

সেইমতে তারা তৈরি হলো।

এ খবর হযরত খাদিজা (রা)—এর কানেও গেল।

তিনি হযরতকে কাজ বন্ধ করতে বললেন না।

তিনি নিজে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) বাইরে বের হলেই খেয়াল করেন, তিনি কখন কোথায় যান, কেমন আছেন।

হযরতের ওপর তাঁর সব সময় চোখ। যদি কখনো বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, যদি কখনো তাঁর খবর সহজে না পাওয়া যায়, খাদিজা চিন্তায় পড়েন। তিনি নিজে ছুটে যান। খোঁজ নেন হযরত কোথায়, কি করছেন।

যদি কখনও নবীজী (সা) কোরাইশদের আঘাতে শরীরে আঘাত পান, যদি তিনি অবসন্ন দেহে কোথাও বসে থাকেন, খাদিজা (রা) তাঁকে খুঁজে বের করেন।

তাঁর নিজের আঁচল দিয়ে তাঁর গায়ের রক্ত মুছে দেন।

সেবা ও যত্নে তাঁর শরীর থেকে আঘাতের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলেন।

হযরত খাদিজা (রা) সর্বশক্তিমানের কাছে হযরতের জন্য আকুল প্রার্থনা করেন।

খাদিজার সেবায় ও যত্নে তাড়াতাড়ি নবী করীম (সা) সুস্থ হয়ে ওঠেন। উঠেই ফের তাঁর কাজে লেগে পড়েন।

পদে পদে তাঁর জন্য বাধা। কিন্তু তিনি কিছুই মানেন না। এমন দিনে কে তাঁর বন্ধু? হযরত খাদিজা (রা) তাঁর বিশ্বস্ত সংগিনী। প্রতি মুহূর্তে হযরত মুহাম্মদের কল্যাণ কামনা করেন। সারাক্ষণ তাঁর কথা ভাবেন।

তাঁর যেন কষ্ট না হয়, সেজন্য হুঁশিয়ার থাকেন। বিপদে আপদে তিনিই আগে আগে এগিয়ে আসেন।

সেবা করেন।

সাহায্য করেন।

সান্ত্বনা দেন।

উৎসাহ দেন।

তাঁর এমন সহযোগিতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরম সম্পদ।

মহাকালের পথে

দেখতে দেখতে পঁচিশটি বছর কেটে গেল।

হযরত খাদিজা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তবু তাঁর নিজের দিকে লক্ষ্য নেই।

দিনমান তিনি কেবল স্বামী, সন্তান, সংসার আর দেশের মানুষের কথা ভাবেন। আরাম কাকে বলে তা যেন তিনি জানেনই না।

এক সময় তাঁর অসুখ বেড়ে যায়।

হযরত (সা) ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

নিজে খাদিজা (রা)-এর মাথার কাছে বসে থাকেন। খাদিজা (রা) হয়তো কিছুটা ভালো হয়ে ওঠেন। আবার অসুখে পড়েন। এমনি করে একদিন এমনভাবে বিছানা নিলেন যে, আর ভালো হলেন না। রোগ বেড়েই চলে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। কথা বলতে কষ্ট হয়। রাতে ঘুম নেই। সারা শরীরে অস্থিরতা।

তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চান। বলেন–'আমি চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি। তোমরা, আমাকে মাফ করে দিও।'

তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তিনি চিরদিনের জন্য চোখ বোঁজেন। সেদিন কোনও এক রমযান মাসের দশ তারিখ।

তাঁর বয়স তখন পঁয়ষট্টি বছর।

তুলনাহীনা

মানুষ চিরকাল বাঁচে না।

হযরত খাদিজা (রা)–ও বাঁচলেন না, চলে গেলেন সকলকে রেখে। তাঁর চার মেয়ে, দু' ছেলে। ছেলেদের মধ্যে একজন সবার বড়, বাকীরা ছোট। দু'জনেই কোলে থাকতে মারা যান। মেয়েরা মধ্যখানে। জয়নাব, রোকেয়া, কুলসুম, ফাতিমা।

ফাতিমার বিয়ে হয় হযরতের চাচাত ভাই শেরে খোদা হযরত আলী (রা)–এর সাথে।

তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দু'জন বাঁচেন—নাম হাসান ও হোসেন। মেয়েও তাঁর দু'জন

হযরত খাদিজা (রা)–এর মৃত্যুতে মেয়েরা মুষড়ে পড়েন। পরিচিত অপরিচিত সবাই দুঃখিত হন। হাযার হাযার মানুষ তাঁর জন্য অঝোরে কাঁদে। তাঁর দানের কথা কেউ ভোলে না– ভুলতে পারে না তাঁর মায়া–মমতার কথা। তাঁর মত দরদী মন আর তো কারুর ছিল না।

তিনিই সবার মধ্যে প্রথম মুসলমান। সব মুসলমান তাঁকে বলে 'উম্মুল মুমিনীন'।

'উম্মুল মুমিনীন' মানে মুমিনদের মা।

হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত খাদিজা (রা)-এর কথা বলেছেন। খাদিজার ত্যাগের কথা তিনি সকলকে জানিয়েছেন। তাঁর নবুয়ত লাভের দিনগুলোতে, তাঁর ইসলাম প্রচারের সময়ে হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে কতো উৎসাহ ও সাহায্যই না দিয়েছেন।

হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে কেবল শ্রদ্ধাভক্তিই করেননি—তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাসও রেখেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজেও খাদিজা (রা)-কে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। তাঁর প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর সবার চাইতে ছিল বেশি। একথা তিনি স্বীকারও করেছেন মুক্তকণ্ঠে।

খাদিজা (রা)-কে তিনিও বিশ্বাস করেছেন খুব।

হযরত খাদিজা (রা)-এর ছোট মেয়ে যে ফাতিমা, তাঁর বংশধররাই তো আজ অবধি সকলের কাছে নবী-বংশ বলে পরিচিত।

ফাতিমা (রা)-এর দুই ছেলে হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসেন (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খুব আদরের ধন। এ দিয়েই বোঝা যায়, হযরত খাদিজা (রা)-এর জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর টান ছিল কতো গভীর।

খাদিজা (রা)-এর তুলনা সত্যি হয় না।

তাঁর তুলনা বুঝি তিনি নিজেই।

ইফাবা-৯৮-৯৯-প্র/৪২৪৪(উ)-৫২৫০

লেখক পরিচিতি

হোসনে আরা শাহেদ। ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রে এম.এ.। ঢাকা শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। লিখছেন কিশোর বয়স থেকে। আজও লেখা তাঁর মনের প্রধান অবলম্বন। ফ্রি-ল্যান্স কলামিস্ট। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। সুদীর্ঘ আঠারো বছর দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'পথের পাঁচালি' কলাম লিখে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ছোটদের জন্যও তিনি লিখে চলেছেন। শিশুতোষ গ্রন্থসহ সব ধরনের লেখা মিলিয়ে এ যাবত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা সাঁইত্রিশ। এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা তিন।

'বাংলা একাডেমী' ও 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ'-এর তিনি জীবন সদস্য। 'The World Literary Academy'-র ফেলো ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ